দারিদ্র-সংলাপ মানবিকীকরণের লক্ষ্যে *

- *মো: আনিসুর রহমান*

ফোকাস: (১) <u>দারিদ্র</u> বলতে কী বুঝব যা মানুষের চরম যাতনা ও গভীর চাহিদা প্রকাশ করে।
(২) <u>দারিদ্র বিমোচন</u> বলতে কী বুঝব যাতে দেশের সব পিছিয়ে থাকা মানুষকে ইতিবাচক জীবন-কাজে আত্ম-নিয়োজিত করবার সম্ভাবনা বাড়ে।

<u>সারাংশ</u>

সাম্প্রতিক কালে বিশ্বব্যাঙ্ক-প্রভাবিত যে "দারিদ্র-রেখা" এদেশে এবং অন্য অনেক দেশেই ব্যবহৃত হচ্ছে সেটি রবীন্দ্রনাথ ও আই,এল,ও-র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উচ্চারিত দারিদ্র প্রত্যয়ের তুলনায় চিন্তা ও মানবতাবোধের দিক দিয়ে পিছিয়ে গিয়েছে। দারিদ্র-বিমোচন প্রচেষ্টার আসল উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সমাজের 'দুখী মানুষ'দের জীবন-যন্ত্রণা দূর বা লাঘব করা। এর জন্য সমাজের বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠীর জীবন-যন্ত্রণার স্বরুপ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। দেশের লক্ষ-লক্ষ 'অচ্ছুৎ' সম্প্রদায়সমূহের তীব্রতম জীবন-যন্ত্রণা তাদের আয় দিয়ে মাপা যায় না। দেশের নারী-সমাজের নানাভাবে পুরুষ-শাসিত ও অত্যাচরিত জীবনের যন্ত্রণাও শুধু আয়ের প্রশ্ন নয়। দেশের অসংখ্য মানুষ বিভিন্নরকম সন্ত্রাস ও বর্বরতার শিকার হয়ে চলেছে যে জন্য মানুষের নিরাপদে বাঁচবার উপকরণ "মৌলিক চাহিদার ঝুড়ি"তে থাকা অতীব প্রয়োজন। আর দৈহিক-পেশী-নির্ভর জীবিকা-ধারী মানুষদের দারিদ্রের একটি বিশেষ চরিত্র এরকম কাজ বেশিদিন করে যেতে পারবার অনিশ্চয়তা যেজন্য তাদের আয়ের স্থায়ীত্বের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। এসব বিভিন্ন প্রকার জীবন-যন্ত্রনা বোঝবার জন্য এবং যথাসম্ভব স্থায়ীভাবে লাঘবের জন্য শুধু সংখ্যাগত অনুসন্ধান নয়, গুনগত অনুসন্ধানেরও বিশেষ প্রয়োজন। আর দারিদ্রের সংখ্যাগত প্রশ্নটিও মানুষের চেতনায় কোন অনড় "দারিদ্র-রেখা"র প্রশ্ন নয়, এটি আপেক্ষিক প্রশ্ন যা সমাজে উন্নত জীবন-মানের প্রদর্শনে ওপরে উঠতে থাকে। এদেশে জমির স্বল্পতার জন্য বিলাসী ও দুখী মানুষদের পরস্পরের গা ঘেঁসে বাস করতে ও চলাফেরা করতে হয় বলে এই প্রদর্শনীর প্রভাব বিশেষ তীব্র।

দারিদ্র সংলাপে আর একটি বড়ো অবহেলিত প্রশ্ন যে-কোন সময়কালে যারা "দারিদ্রে" বা বিভিন্নরকম যাতনায় পর্যুদস্ত থেকে যায় তাদের কীভাবে নেতিবাচক সমাজ-বিরোধী জীবন-পথে যাওয়া থেকে বিরত রেখে ইতিবাচক জীবন-কর্মে লিপ্ত রাখা যায়। সমাজে দারিদ্রাবস্থার ইনক্রিমেন্টাল উন্নতি এই "গ্লাশের অপর অংশের অস্থিরতার" সমস্যার কোন উত্তরই নয়। এর জন্য এই মানুষদের সামাজিক সলিডারিটির বলয়ে আনা প্রয়োজন যেখানে তারা মানসিক আশ্রয় পেতে পারে এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন রকম ইতিবাচক যৌথ উদ্যোগে অংশীদার হতে পারে। এই উদ্দেশ্যে এদেশে দুখী মানুষদের মধ্যে অনেকে যারা বিভিন্ন 'মালিক'শ্রেণীর কাছে পেট্রুণ-ক্লায়েন্ট সম্পর্কে আবদ্ধ তা থেকে তাদের মুক্তির জন্য এবং নিজেদের সলিডারিটি গ্রুপ সৃষ্টির সুযোগের জন্য কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন। দেশের সব মানুষকে দ্রুত সাক্ষর করে তোলাও প্রয়োজন তাদের সক্ষমতা বাড়াবার জন্য। বর্তমানে দেশের হাতে অত্যন্ত দ্রুত সাক্ষরতাদানের পদ্ধতি এসে গেছে যা প্রযোগ ক'রে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এবং মামুলী খরচে সমস্ত দেশবাসীকে সাক্ষর করে তোলা যায় যে ব্যাপারে পদক্ষেপে বিলম্ব অনুচিত।

সবশেষে, দারিদ্রের মতো নিবিড় জীবন-যাতনার প্রশ্নে দুখী মানুষদের মতামত নেবার সুপারিশ করা হয়েছে।

১. দারিদ্র সংলাপের পিছুগতি

'উন্নয়ন' সম্বন্ধে নব্বই বছর আগে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছিলেন তার মধ্যে একটা দারিদ্র প্রত্যয়ের ইঙ্গিত রয়েছে:

"যে জাতি উন্নতির পথে বেড়ে চলেছে তার একটা লক্ষণ এই যে, ক্রমশই সে-জাতির প্রত্যেক ... ব্যক্তির অকিঞ্চিৎকরতা চলে যাচ্ছে। যথাসম্ভব তাদের সকলেই মনুষ্যত্বের পুরো গৌরব দাবি করবার অধিকার পাচ্ছে। এজন্যেই সেখানে মানুষ ভাবছে, কী করলে সেখানকার প্রত্যেকেই ভদ্র বাসায় বাস করবে, ভদ্রোচিত শিক্ষা পাবে, ভালো খাবে, ভালো পরবে, রোগের হাত থেকে বাঁচবে, এবং যথেষ্ট অবকাশ ও স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে।" "বাতায়নিকের পত্র". *কালান্তর* , রবীন্দ্র রচনাবলী ২৪, ১৩২৬ পৃ: ৩১৩-৪)

বিশেষ লক্ষ্যনীয় যে, রবীন্দ্রনাথ উন্নয়নের প্রশ্নে "মানুষ কী ভাবছে" এই কথা লিখেছেন, বিশেষজ্ঞদের ভাবনার কথা নয়। আর তিনি তো মানুষের মনের কথা গভীরভাবে বুঝেছিলেন বলেই বিশেষভাবে খ্যাত। তাঁর বক্তব্যে "ভদ্রোচিত" কথাটি এবং মানুষের যথেষ্ট অবকাশের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখযোগ্য।

মুলধারার উন্নয়ন-সংলাপে মানুষের "মৌলিক চাহিদা" র প্রথম বিশ্ব-দৃষ্টি আকর্ষনকারী সংজ্ঞা পেশ করে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা:

"Firstly, ...certain minimum requirements of a family for private consumption : adequate food, shelter and clothing, as well as certain household furniture and equipments. Second, ...essential services provided by and for the community at large, such as safe drinking water, sanitation, public transport and health, education and cultural facilities....The concept of basic needs should be placed within the context of a nation's overall economic and social development. In no circumstances should it taken to mean merely the minimum necessary for subsistence." ILO *Employment, Growth and Basic Needs: A One World Problem.* Geneva. (1976). (italics added)

এই সংজ্ঞায় বিশেষ লক্ষ্যনীয় যে মানুষের "মৌলিক চাহিদা" শুধুমাত্র কোনরকমে খেয়ে-পড়ে বাঁচবার উপকরণ হিসাবে দেখা হয় নি, মানুষের সাংস্কৃতিক প্রয়োজনও এর অন্তর্ভুক্ত যা রবীন্দ্রনাথের 'অবকাশ'-এর প্রয়োজনীয়তার সুর বহন করে। আরো উল্লেখযোগ্য যে কোন অনড় আয়-সংখ্যা হিসাবে নয়, দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে এই চাহিদা দেখা হয়েছে। (রবীন্দ্রনাথের "ভদ্রোচিত" কথাটির মধ্যেও এই ইঙ্গিত রয়েছে বলা যায়।)

দু:খের বিষয় সাম্প্রতিককালে মানুষের "মৌলিক চাহিদা"র ধারণাটি অনেক সঙ্কীর্ণ হয়ে গিয়েছে, যেখানে কালের অগ্রগতির সঙ্গে চিন্তারও বিকাশই আশা করা যুক্তিসঙ্গত (১)। অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও মানুষের মৌলিক চাহিদা একটি "দারিদ্র-রেখা" দিয়ে পরিমাপ করা হয়। বিশ্বব্যাঙ্কের সহযোগীতায় বাংলাদেশ সরকারের ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিক্স এই "দারিদ্র-রেখা" সংজ্ঞায়িত করেছে মূলত: একটি "খাদ্য-ঝুড়ি" দিয়ে যা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্যালোরী সরবরাহ করে এবং তার সঙ্গে এই পরিমান ক্যালোরী খায় এরকম পরিবাররা অন্যান্য খাতে যা খরচ করে তা যোগ ক'রে (২) ।

আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি (৩) যে এরকম একটা দারিদ্র-রেখা তথা "মৌলিক চাহিদা"র প্রত্যয় মূলত: নীচের তলার মানুষদের - আমি এদের জাতির পিতার ভাষায় "দুখী মানুষ" বলব - দৈহিক শ্রমক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখবার উদ্বেগই প্রকাশ করে (তার সঙ্গে দায়সারাভাবে তাদের অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য একটা মামুলি বরাদ্দ দিয়ে)। এই ধরণের দারিদ্র প্রত্যয় ও দারিদ্র বিমোচনের জন্য উদ্বেগ এসব মানুষকে যেন মানুষ নয়, গবাদি পশুর মতোই গণ্য করে যে পশু থেকে অপরে দুধ, দেহ-শ্রম, মাংস ইত্যাদি আদায় করতে পারবে। এরকম দারিদ্র গণনা অমানবিক এবং একটি মানব-শ্রম-শোষণবাদী দর্শনেরই পরিচায়ক বলা যায়। দারিদ্র্য নিয়ে মানবিক উদ্বেগের কারণ নিশ্চয়ই দুখী মানুষদের সত্যিকারের জীবন-যাতনা দূর

বা অন্ততঃ লাঘব করবার স্পৃহা। কিন্তু তাদের জীবন-যাতনা কী শুধুই বা মূলতঃ কম ক্যালোরী খাবার, বা কম আয়েরই, প্রশ্ন?

২. দুখী মানুষের জীবন-যাতনার স্বরূপ

আমাদের অনেকেরই হয়তো জানাই নেই যে এদেশে বিরাট সংখ্যক জনসমষ্টি রয়েছে - *হরিজন, দলিত, মুন্ডা, মুচি, রবিদাস, কেওড়া, বাওয়ালি, পাল, বাগদী, নাগারচি, ঝাড়ুদার, ঋষি, বুনো, রবিদাস, মানতা, বেদে, নাগারচি, শব্দকর ইত্যাদি শ্রেণী* - অমুসলমান এবং মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই - যারা সমাজে অচ্ছুৎ বলে গণ্য। এদের অন্য শ্রেণীর মানুষরা ঘৃণাবশতঃ (?) স্পর্শ করে না, এদের রাস্তার ধারের চা-এর স্টলে চা পরিবেশন করা হয় না, এদের সন্তানরা স্কুলে অনাকাঙ্খিত। এমন কী এদের কেউ কোনরকমে লেখাপড়া শিখে এন,জি,ও-তে চাকরী পেয়ে পরে তার জাতি-পরিচয় প্রকাশ হলে বরখাস্ত হয়েছে এরকম দৃষ্টান্তও রয়েছে। দারিদ্র-গবেষণা-সহায়ক সংস্থা রি-ই-ব-সহায়িত বেশ কিছু গবেষণায় এই হতভাগ্য শ্রেণীগুলির মর্মস্পর্শী জীবনের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে যে জীবনের নিরন্তর তীব্র যাতনার মাপ এবং উপশম টাকা দিয়ে হয় না। এদের অধিকাংশেরই অনেক জমি-জমাও অন্যায়ভাবে বেদখল হয়েছে এই অন্যায় প্রতিহত করবার এদের সামাজিক শক্তি নেই বলে। এদের মোট সংখ্যার স্বীকৃত হিসাব আমার চোখে পড়ে নি, তবে এদের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল বিভিন্ন মহলের আলোচনায় শোনা যায় এই সংখ্যা পঞ্চাশ লাখ থেকে দেড়শ' লাখ এর মধ্যে কোথাও হবে (শুধু হরিজনদেরই সংখ্যা ১৫ লাখের মতো বলে শুনেছি)।

দেশের এরকম হতভাগ্য 'অস্পৃশ্য' শ্রেণীসমুহের আর্থিক অবস্থা নির্বিশেষে মানবেতর জীবনের কাহিনি ছাড়াও বহু অঞ্চলে-যে মানুষ সন্ত্রাসের ভয়ে আতঙ্কে দিন বা রাত্রি কাটাচ্ছে এই নিরাপত্তাহীনতাও তাদের দারিদ্রের একটা সূচক নয় কী। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের জমি-জমা কেড়ে নিয়ে তাদের গড়িয়ে ফেলে দেবার যে প্রক্রিয়া দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে এই প্রক্রিয়াও। মূলভূমি বাংলাদেশেরও গ্রামাঞ্চলে পাশবিক বর্বরতায় ক্ষমতাহীন মানুষদের জমি-জমা কেড়ে নিয়ে তাদের নিংস্ব নিরাশ্রয় করে দেবার সংবাদ প্রায়ই সংবাদপত্রে উঠছে - এরকম ঘটনার আগে তারা "দারিদ্র-সীমারেখার" ওপরে ছিল এটা কী যথেষ্ট। আর মোট গণনায় আগের তুলনায় আজ দারিদ্র-সীমারেখার ওপরে কিছু বেশি শতাংশ মানুষ এসে গেলেও অন্যদিকে অনেক পরিবার তো নানা দুর্বিপাকে পড়ে আগের চেয়ে নীচেও গড়িয়ে পড়ছে (তুলঃ জুলফিকার আলী, শরীফা বেগম, কাজী শাহাবুদ্দীন, মরিয়ম খান; নায়লা কবীর), কেউ কেউ সর্বস্বান্ত হয়েই যাচ্ছে - এরকম মানুষদের হাহাকার যারা ওপরে উঠে যাচ্ছে তাদের 'আনন্দ' দিয়ে কী মুছে ফেলা যায়। সামষ্টিক সামাজিক 'ইউটিলিটি' হিসাবেও কিছু পরিমান মানুষের আয় বাড়লে যেটুকু সামাজিক 'ইউটিলিটি' লাভ হয় অন্যের সেই পরিমান আয় কমে গেলে কী সেইটুকু 'ইউটিলিটি'ই মাত্র হারানো হয়। কিন্তু আরো মানবিক প্রশ্নঃ পিতা-মাতার এক সন্তানকে ভূলুণ্ঠিত করে যদি আর এক সন্তান ধনী হয় তাহলে কী পরিবারটার উন্নতি হলো বলে তাদের আনন্দ করবার ব্যাপার হবে। সমাজের বেলাতেও একই মূল্যবোধ থাকবে না কেন।

এদেশের নারী সমাজের বৃহদাংশের নিরন্তর নিপিড়িত শঙ্কাকুল জীবনের কথাও সুবিদিত যে জীবনেরও আনন্দ সম্মান ও নিরাপত্তা শুধুমাত্র আয় বাড়িয়ে দেয়া যায় না। দেশের অসংখ্য নারীর জীবন অকাল বিবাহে শৈশবের জীবন-ফুল ফোটার স্বাদ গ্রহন থেকে বঞ্চিত; অসংখ্য নারী নিত্য স্বামীর কাছে দৈহিক অত্যাচারে নিপীড়িত; অন্যায় তালাকের ভয়ে অসংখ্য নারী নিয়ত শঙ্কাকুল, এরকম তালাকে অথবা স্বামী বিয়োগেও সন্তানাদি নিয়ে

সম্ভ্রম বাঁচিয়ে জীবন রক্ষা অনেকের পক্ষেই দুরুহ। সন্তানের মুখে (নিজের পেটের চিন্তা বাদ দিয়েই) একটু ভাত দেবার জন্য সম্ভ্রম বেচতে হবে এরকম অবস্থায় কূল-কিনারা না পেয়ে মা-এর দেহ-মন অবশ হয়ে যায়, তার পরে হয় সে সম্ভ্রমই বিক্রী করে নয় তো সন্তানকে হত্যা ক'রে নিজেও আত্মহত্যা করে এরকম দৃষ্টান্ত তো বিরল নয়। এরকম বাস্তবতার জন্য নারীর দারিদ্রের (যাতনার) প্রশ্নটি আগে-ক্যালরি-পরে-সম্মান এরকম লিনিয়র স্কেলে দেখা একেবারেই চলে না, তার দুমুখী তীব্র চাহিদা - নিজের ও মা হলে সন্তানের মুখে ভাত এবং আপন মর্যাদা-সম্ভ্রম রক্ষা - একই সঙ্গেই তো তাকে কশাঘাত করে। অন্যায় বিচারে দোররার আঘাতের যাতনা ও চরমতম সামাজিক অপমান কি নারীকে ”দারিদ্র-সীমারেখার” ওপরে তুলে মুছে দেয়া যায় - আয়-নির্বিশেষে এটাই তার দারিদ্রের তীব্রতম প্রকাশ নয় কী। কিশোরী মেয়েকে নিরাপদে রাস্তায় সন্ত্রাসীর হাত থেকে বাঁচিয়ে শিক্ষাঙ্গনে পাঠাবার সামর্থও অসংখ্য পিতামাতার নেই যে নিরাপত্তার জন্য দারিদ্র গণনায় আলাদা করে কোন বরাদ্দ নেই, এমন কি আধুনিক সভ্যতার দান দুটো মোবাইল ফোনেরও বরাদ্দ নেই যা নিজের ও পরিবারের সঙ্গে থাকলে সন্ত্রাসী দ্বারা আক্রান্ত হবার উপক্রম দেখলে পরিবারকে মোবাইলে *এস,ও,এস* পাঠাবার অন্ততঃ চেষ্টাটা করা যেতে পারে। আর নারীদের জন্য বরাদ্দকৃত মৌলিক চাহিদার ঝুড়িও অনেক ক্ষেত্রেই তো তাদের পরিবার-প্রধানেরই দখলে থেকে যায়, তার নিজের ইচ্ছাধীন খরচ করবার জন্য স্বাধীনতা তার তো অনেক ক্ষেত্রেই নেই। স্বামী ঘরে দ্বিতীয় স্ত্রী আনলে পরিবারের গড় আয় বাড়লেও অবহেলায় বঞ্চনায় দৈহিক অত্যাচারে প্রথম স্ত্রীর দারিদ্র নানান্ অর্থে সঙ্গীনভাবে বাড়ে । এরকম একটি অসম্মানজনক শঙ্কাকূল বিষম পারিবারিক সম্পর্কে ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতায় জটপাকানো অবস্থায় এদেশের নারীকুলের জন্য দারিদ্র-গবেষণার ”মৌলিক চাহিদার ঝুড়ি”র কাল্পনিক বরাদ্দ-কী যথেষ্ট।

আরো অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে এদেশের মানুষের কঠিন জীবনসংগ্রামের যে সংগ্রাম চল্‌তি দারিদ্র গণনায় ধরা পড়ছে না। এদেশের রিক্সাওয়ালাদের সাময়িক আয় দারিদ্র-সীমারেখার ওপরে যদি হয়ও তাহলেও তাদের অনেকেরই দুই পা-এর শক্তি ক্ষয় ক'রে ক'রে এই আয় ক'রে যাবার শারীরিক ক্ষমতা বেশিকাল থাকে না (তথঃ শরীফা বেগম ও বিনায়ক সেন)। খেটে-খাওয়া মানুষদের আরো অনেককে এরকম দৈহিক পেশী-নির্ভর কাজ ক'রে জীবিকার সঙ্কুলান করতে হয় যাতে তাদের কারো কারো সাময়িক আয় ”দারিদ্র সীমারেখা”র ওপরে উঠলেও এরকম কাজ বেশিদিন করে যাওয়া তাদের অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। চল্‌তি দারিদ্র-গণনায় মানুষের আয়ের স্থায়ীত্বের প্রশ্নটি (৪) এবং বার্ধক্যে সোসাল সিকিউরিটির প্রশ্নটিও অবহেলিত। আর রবীন্দ্রনাথ/আই,এল,ও-র প্রস্তাব অনুযায়ী অবকাশের/সংস্কৃতি-চর্চার জন্য কিছু সময়ের বরাদ্দ কি দুখী মানুষরা দারিদ্র-রেখায় চাইতে পারে না।

আমার প্রস্তাব দুখী মানুষদের শুধু শ্রম-দানকারী নয়, মানুষ হিসাবে গণ্য করে তাদের জীবন-যন্ত্রনার বিভিন্ন স্বরূপ জানবার ও বোঝবার চেষ্টা করা এবং এসব বিভিন্ন প্রকার জীবন-যন্ত্রনা যথাসম্ভব স্থায়ীভাবে লাঘবের পথ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। এভাবে জানবার-বোঝবার-অনুসন্ধানের পথ শুধু আয়-ব্যায়ের হিসাব নিয়ে অর্থাৎ কোয়ান্টিটেটিভ্ গবেষণা নয়। এই জানা-বোঝা-অনুসন্ধানের পথ জীবন-যন্ত্রনায় জর্জড়িত মানুষের সামগ্রিক জীবনকে গভীরভাবে বোঝবার চেষ্টা, যে চেষ্টায় কোয়ালিটেটিভ্ অনুসন্ধানের বিশেষ প্রয়োজন।

৩. টিপে-টিপে (ম্যাক্রো) দারিদ্র বিমোচন ও ”গ্লাশের অপর অংশের অস্থিরতার সমস্যা”

তার পরেও একটা অত্যন্ত বড়ো প্রশ্ন আছে। ধরা যাক্ যে কোনভাবেই হোক একটি বছরে দুখী মানুষদের কিছু শতাংশের দু:খের কিছুটা উপশম করা গেল, এবং এভাবে এক বছরে দেশের শতকরা ৬০ পার্সেন্ট মানুষ থেকে ৬২ পার্সেন্ট মানুষকে "দারিদ্র-রেখার" ওপরে তোলা গেল। বাস্তবতাটি কিন্তু থেকেই গেল যে এই উন্নত অবস্থাতেও দেশের ৩৮ শতাংশ মানুষ এই "দারিদ্র সীমারেখার" নীচে অবস্থান ক'রে বিভিন্ন রকম যন্ত্রণায় জর্জরিত। (এদের মধ্যে এক-অংশ যারা আগে "দারিদ্র-রেখার" ওপরই ছিল কিন্তু পরে নানা দুর্বিপাকে পড়ে নীচে গড়িয়ে পড়েছে বলে তাদের যন্ত্রণা আরো তীব্রও হতে পারে যে কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে।) এই শতকরা ৩৮ ভাগ বাকী মানুষরা দেশের এরকম উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে - যে প্রক্রিয়ায় তাদের জীবন-যন্ত্রনার উল্লেখযোগ্য উপশম হয় নি এবং ব্যক্তিহিসাবে কার কবে হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই যা পেলে সেই আশায় ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবার একটা যুক্তি হোত - এরকম উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে সহযোগিতা করে যাবে এই আশা কী যুক্তিতে করা যায়। তারা - সবাই না হলেও অনেকে - কেন এই উন্নয়ন-প্রক্রিয়াকে প্রত্যাখ্যান করে সন্ত্রাস সহ বিভিন্ন রকম অসামাজিক কার্যকলাপের পথ বেছে নেবে না, স্বাধীনভাবে কিম্বা দলীয় সন্ত্রাস করে বা মৌলবাদের শিবিরে যোগ দিয়ে। এই সমস্যাটিকে আমি "গ্লাশের অপর অংশের অস্থিরতার সমস্যা" বলে আখ্যায়িত ক'রে আসছি। ম্যাক্রো-দারিদ্র গণনায় টিপে-টিপে ('ইনক্রিমেন্টাল') উন্নতি এই সমস্যার কোন সমাধানই নয় - এরকম টিপে-টিপে উন্নতি বছরে দুই শতাংশ পয়েন্টই হোক বা আরো বেশি পয়েন্টই হোক না কেন যতক্ষণ "গ্লাশের অপর অংশটি" কলেবরে সমাজে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির জন্য এমনকি বাড়াবার জন্যও যথেষ্ট থাকে। বিশ্বের দারিদ্র সংলাপ এই "গ্লাশের অপর অংশের অস্থিরতার সমস্যা" কে অদ্যাবধি উপেক্ষা করে চলেছে, এবং বাংলাদেশ-সহ বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে কিছু 'উন্নয়ন' উপভোগ করছে এরকম নানান্ দেশেই সামাজিক অস্থিতিশীলতা থেকেই যাচ্ছে এমনকি কোন কোন দেশে বেড়েও চলেছে। সমাজের দারিদ্র-অবস্থার এরকম টিপে-টিপে উন্নতি সমাজের নিয়মতান্ত্রিকতা ধ্বসে পড়বার এই সম্ভাবনার কোন উত্তরই নয়। তাই সামাজিক স্থিতিশীলতার দৃষ্টিকোন থেকেও দারিদ্র, অর্থাৎ দুখী মানুষের যাতনার, সমস্যাটি সমাজের বৃহৎ এক জনগোষ্ঠীর তীব যাতনা লাঘবের সমস্যা থেকেই যায় চল্‌তি দারিদ্র গণনায় দেশে "দারিদ্র-বিমোচন" উল্লেখযোগ্য হারে হতে থাকলেও। এই বাস্তব সমস্যার উত্তরে এই "গ্লাশের অপর অংশ"কে ইতিবাচক জীবন-কর্মে নিয়োজিত রাখবার পরিবেশ সন্ধান করা প্রয়োজন।

বাস্তবে এই "গ্লাশের অপর অংশটি" দারিদ্র গণনার মাপকাঠি অনুযায়ী এই অংশের হিসাবের চেয়ে আরো বড়ো। কারণ, যে কথা রবীন্দ্রনাথের "ভদ্রোচিত" এবং আই,এল,ও-র "মৌলিক চাহিদা" প্রত্যয়ে নিহিত আছে, মানুষের কাছে তার দারিদ্র-চেতনা তো স্বভাবত:ই আপেক্ষিক, এব্‌সলুট নয় (জেমস্ ডুসেনবেরির মানুষের ভোগ-লিপ্সার আন্ত:নির্ভরতার তত্ত্ব স্মরণ করুণ (৫))। প্রতিবেশীর ঘরে ডিশ্ এন্টেনা বা গাড়ী বা বিয়ের জৌলুস দেখলে আমার বা আমার সন্তানেরও ওইরকম "ভদ্রলোক" হতে অদম্য ইচ্ছা করতে পারে এবং এজন্য দুর্নীতি-অনাচার-সন্ত্রাসের দিকেও মন ঝুঁকতেই পারে। রাস্তায় ঘন ঘন মোবাইল ছিনতাইও তো সমাজে এই বৈষম্যের সমস্যাটিরই একটি ক্ষুদ্র বহির্প্রকাশ বলা যেতে পারে। রিক্সাওয়ালার কিশোরী কন্যা ঈদে নতুন জামা না পেয়ে আত্মহত্যা করেছে এই সংবাদ গত ঈদের প্রাক্কালে *দি ডেইলী স্টারে* উঠেছিল (তারিখ মনে নেই) এটাও তো আপেক্ষিক দারিদ্র-চেতনার যাতনারই চরম বেদনাদায়ক প্রকাশ। এরকম কিশোরীদের কী করে বোঝান যাবে যে তাদের এই কারণে আত্মহত্যা করা উচিত নয় কারণ "দারিদ্র-রেখায়" ঈদের জামার বরাদ্দ তো নেই। সাম্প্রতিক বি,ডি,আর-এর দেশ-কাঁপানো বিদ্রোহ এবং অফিসারদের অভাবনীয় নৃশংসতমভাবে হত্যার পেছনেও তো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জোয়ানদের নিজেদের বেতন-ভাতা-সুবিধাদির সঙ্গে অফিসারদের বেতন-ভাতা-সুবিধাধির বৈষম্যও ভূমিকা রেখেছে বলে তদন্ত রিপোর্ট মূল্যায়ন করেছে। এই মূল্যায়ন যদি সত্যি হয় তারপরেও কী দেশের শতকরা ৬০

পার্সেন্ট মানুষ একটা অত্যন্ত নীচু "দারিদ্র-রেখা" পার হয়েছে বলে আত্মপ্রসাদের কোনো যুক্তি আছে। এও মনে রাখা প্রয়োজন যে এদেশে জনসংখ্যার অনুপাতে জমির স্বল্পতার জন্য ওপর আর নীচের তলার মানুষদের পরস্পরের গা ঘেঁসেই বাস ও চলাফেরা করতে হয় যে জন্য বিলাসী জীবনের ডেমন্সট্রেশনটা দুখী মানুষদের চোখে তীব্র হয়েই আঘাত ক'রে চলে, তাদের সন্তানদের মনেও নিরন্তর প্রশ্ন জাগিয়ে রাখে, এবং এই জন্য "গ্লাশের অপর অংশের অস্থিরতা"র সমস্যাটি আমাদের মতো দেশে বিশেষভাবে তীব্র হওয়াই স্বাভাবিক।

বাস্তবিকপক্ষে, দারিদ্র-চেতনার জন্মই কি বৈষম্য থেকে হয় নি। তাহলে দারিদ্রের পরিমাপও কী সমাজে বৈষম্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকবে না?

৪. সামাজিক সলিডারিটির সন্ধানে

বিভিন্ন রকম দুখী মানুষদের - তারা "দারিদ্র-সীমারেখা"র ওপরেই থাক বা নীচেই থাক -যাতনা লাঘবের একটি প্রধান পন্থা তাদের বিভিন্নভাবে সামাজিক একাত্মতা - সলিডারিটি ("সামাজিক পুঁজি") - দেয়া। এ-সম্বন্ধে আমাদের কথা-সাহিত্যে কিছু অত্যন্ত গভীর অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যায়। যেমন রবীন্দ্রনাথের *'পোষ্টমাস্টার'* গল্পে রতনের দারিদ্র তো শুধু তার ভাত-কাপড়-বাসস্থানের প্রশ্নে নয় - তার গভীরতম অভাব ছিল তার মানসিক আশ্রয়বোধের অভাব যে জন্য সে আকুলভাবে তার অতি পরিচিত পোষ্টমাস্টারকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল সেই পোষ্টমাষ্টার যখন বদলি হন তখন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পথের পাঁচালির* অপুর মা যখন অপুকে বলেছিলেন সে যেন কলকাতায় কলেজে পড়বার জন্য না যায়, এই গ্রামেই তার কাছে থাকে সামান্য পুরোহিতের চাকরী নিয়ে এই কথার গভীরতাও চিন্তা করবার মতো - অপুর মায়েরও তো অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের তেমন সমস্যা ছিল না তিনি একটি স্বচ্ছল ঘরেই কাজ পেয়েছিলন যেখানে তাঁর ভাত-কাপড়ের কোন অভাব ছিল না, কিন্তু তবু তিনি সন্তানের কলেজ-শিক্ষার চাইতে তাঁর কাছে থাকাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন একই ধরণের একটা মানসিক আশ্রয়বোধের অভাব থেকেই। আর রবীন্দ্রনাথ দুখী মানুষদের এই আশ্রয়বোধের অভাবকেই চুড়ান্ত গভীরভাবে তাঁর একটি গানে প্রকাশ করেছেন - "মম দু:খের সাধন" গানটিতে, যে-গানে দুখী মানুষটি বলছে *"আমার দু:খে তোমার সঙ্গে মিলনের যে মহালগ্নটি এসেছিল সেই লগ্নটি ব্যর্থ হয়ে গেল যখন আমি তোমার চোখে করুণা দেখলাম, তুমি তো আমার দু:খে সমব্যথী হয়ে আমার হাত ধরলে না, আমার ব্যথায় তোমাকে তো ব্যথিত হতে দেখলাম না"*। এই সমব্যথার মধ্যেই তো দুখী মানুষরা তাদের দু:খে আশ্রয় পায় দু:খ তাৎক্ষনিকভাবে দূর না হলেও। এভাবে মানসিক আশ্রয় পেয়ে দুখী মানুষরা তাদের পরম দু:খেও ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে জীবন-সংগ্রামে এগিয়ে চলত পারে, যা না পেলে তার সমাজে নেতিবাচক ভূমিকা নেবার প্রবণতা বাড়া অস্বাভাবিক নয়।

এরকম মানসিক 'আশ্রয়াভাবগ্রস্থ' মানুষ 'আশ্রয়' পেতে পারে তার একক সত্ত্বা থেকে উন্নীত হয়ে যৌথ সত্ত্বার - "সলিডারিটি গ্রুপের" - সদস্য হয়ে, যে যৌথ সত্ত্বা তাকে একটা বৃহত্তর 'পরিবারের' সদস্য ক'রে তাকে বিভিন্নভাবে সহায় দেবে এবং তাকে সুখে-দু:খে সঙ্গ দেবে। এই যৌথ সত্ত্বা তার অর্থনৈতিক ও মানবিক বিকাশেও অবদান রাখবে ও সহায়তা দেবে এবং এরকম সত্ত্বার বিকাশে সেও তার নিজের অবদান রেখে আত্মতৃপ্তি পাবে। দেশের নানা স্থানে স্বত:স্ফূর্তভাবেই দুখী মানুষদের এরকম সলিডারিটি গ্রুপ সৃষ্টি হয়েছে ও হচ্ছে যার সদস্যরা সুখে-দু:খে একসঙ্গে হাত মিলিয়ে পরস্পরকে মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে জীবন-সংগ্রামে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে, নিজস্ব যৌথ সঞ্চয়-ঋণ সহ বিভিন্নরকম সমবায়-

ভিত্তিক কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়ে পারস্পরীক সহযোগীতায় ও সহমর্মিতায় ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে চলছে (৬), কোথাও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধেও যৌথ প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। কোথাও-কোথাও কোন বাইরের দরদী সংস্থা - যেমন "নিজেরা করি", দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ও রিইব - তাদের এভাবে পরস্পরের হাত ধরে জীবন সংগ্রামে একই রকম ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে যেতে প্রেরণা ও সহযোগিতা দিচ্ছে কোন রকম অর্থসাহায্য ছাড়াই যে প্রচেষ্টায় রিইব ও দি হাঙ্গার প্রজেক্টের 'গণগবেষণা'-এনিমেশন দুখী মানুষদের যৌথ আত্মউন্নয়নে একটি নতুন ধারার সূত্রপাত করেছে (৭)। এতে-যে এভাবে লিপ্ত সবাই "দারিদ্র সীমারেখার" ওপরে উঠে যাচ্ছে তা নয়, এমন কি অনেকে তাদের সমস্ত জীবনকালেই এই সীমারেখার নীচেই থেকে যাচ্ছে, কিন্তু ইতিবাচক জীবন-কর্মে লিপ্ত হয়ে থেকে, যেটা মুল কথা। কিন্তু সব মিলিয়েও এযাবৎ এরকম উদ্যোগের বিস্তৃতি অপেক্ষাকৃত সামান্যই। "গ্লাশের অপর অংশের অস্থিরতার সমস্যার" উত্তর এরকম প্রচেষ্টাতেই যে প্রচেষ্টা এই অপর অংশকে পারস্পরীক সলিডারিটির পরিবেশে ইতিবাচক জীবন-কর্মে লিপ্ত থাকতে প্রেরণা দিতে পারে, এবং এরকম প্রচেষ্টা সারা দেশব্যাপী প্রসারের সামাজিক ঢেউ জাগানোই সামগ্রিকভাবে দেশের দুখী মানুষদের দু:খ উপশম করে যাবার পথ যে পথে তারা চরম দু:খেও মানসিক আশ্রয় পেয়ে এবং যৌথভাবে পরস্পরের চিন্তা ও সম্পদ একত্র করে সৃষ্টিশীলভাবে জীবন-সংগ্রামে এগিয়ে যেতে থাকবে।

৫. উন্নয়ন-প্রচেষ্টা/দারিদ্র মোকাবিলার চ্যালেঞ্জ

বাস্তবিক পক্ষে, সমাজের সব মানুষকে ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে সৃষ্টিশীলভাবে জীবন-সংগ্রামে ও জীবনের বাস্তবতায় আত্ম-অনুসন্ধানে নিয়োজিত করাই উন্নয়ন প্রচেষ্টার তথা দারিদ্র মোকাবিলার চ্যালেঞ্জ। এতে বিভিন্ন মানুষের অর্থনৈতিক দারিদ্র বিভিন্ন গতিতে কমতে থাকবে, অনেকেরই নিজেদের জীবনের অবসান দারিদ্রের মধ্যেই হবে তাদের অনেকে নিজেরা চরম আত্মত্যাগ ক'রে শুধু তাদের সন্তানদেরই জীবনে এগিয়ে দিয়ে এই আত্মতৃপ্তিতেই চোখ বুঁজবে, অনেকে অর্থনৈতিক দারিদ্র নিয়েও তাদের বিশেষ বিশেষ কাজে সৃজনশীলতা দেখিয়ে, কেউ তাদের নিজেদের স্বল্প আয় নিয়েই সমাজকল্যানকর কাজ করে জীবনশেষে হাসিমুখেই বিদায় নেবে (মো. গাহের আলী ভিখারি নওগাঁ-রাজশাহী মহাসড়কে ১৮০০০ গাছ লাগিয়ে গত ৬ই জুন জাতীয় পুরষ্কার পেয়েছেন; চাঁপাইনবাবগঞ্জের দইওয়ালা জিয়াউল হক ঘোষ টাকার অভাবে বই কিনতে না পেরে স্কুলে পড়তে পারেননি বলে তাঁর দই বেচার টাকা দিয়ে গ্রামের তরুণদের বই পড়বার সুবিধার জন্য লাইব্রেরী ক'রে তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন; নাটোরের স্বল্প আয়ের আফাজ পাগলা তাঁর গ্রামে ভেষজ ওষুধ গাছের চারা লাগানো শুরু করেন যা পরে সমস্ত গ্রামে ছড়িয়ে গ্রামকে ভেষজ চিকিৎসায় স্বনির্ভর ক'রে' তোলে - এরকম পূর্ণ মানুষদের দরিদ্র বলবার অধিকার কী আমাদের আছে।) মানব ইতিহাসে সব দেশেই তাই হয়েছে, কোন দেশেই কোন পর্যায়েই সব মানুষের অর্থনৈতিক দারিদ্র বিমোচন হয় নি কিন্তু সমাজ উন্নয়নের প্রগতিশীল পর্যায়ে সার্বিকভাবে মানুষ সৃষ্টিশীলভাবে উন্নয়ন-প্রচেষ্টার অংশীদার হয়েছে। সাম্প্রতিককালে অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল এক উন্নয়ন ও দারিদ্র দর্শন আমাদের অভিভূত করে ফেলেছে যে দর্শন আজ গ্লোবাল মেল্টডাউনের কবলে পড়ে নিজেই ভূপাতিত। বিশ্বের দারিদ্র-তথা-উন্নয়ন-সংলাপে এখনো এই মেল্টডাউনের তেমন কোন প্রভাব পড়ে নি, শুধুমাত্র বারাক ওবামাই অমর্ত্য সেন-এর ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিকাশ-ধর্মী উন্নয়ন-দর্শন ছেড়ে (৮) "কম্যুনিটি সার্ভিসের" অর্থাৎ মানুষে-মানুষে সলিডারিটির প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে শুরু করেছেন যা "আন্তর্জাতিক মানব-অধিকার সনদ"-এরও একটি আহ্বান। কিন্তু উন্নয়ন-চিন্তায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম তিনজন মনীষি - কার্ল মার্কস, মাও জে দং ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - এদের কেউই এরকম দারিদ্র-দর্শন ধারণ করেন নি। *[আমি মার্কসবাদী বা মাওবাদী বা রবীন্দ্রবাদী কোনটাই নই, তবে এই তিনজন দার্শনিকই মানুষ ও সমাজ-*

জীবন সম্বন্ধে গভীরতম বক্তব্য রেখেছেন বলে আমার মূল্যায়ন।] মার্কস ও মাও মানুষের "দারিদ্র" কথাটি ব্যবহারই করেন নি এবং "দারিদ্র"কে কোন সমস্যা হিসাবে চিহ্নিতই করেন নি। মার্কস বলেছিলেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হলে শ্রমিক শ্রেণী তাদের নিজেদের ইতিহাস নিজেরাই রচনা করবে। এই রচনার প্রক্রিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর অনেকেই অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র থেকেই শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করবে সেটা অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তারা শোষন-মুক্ত হয়ে তাদের জীবনে তাদের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিশীল পরিচয় রেখে যাবে মার্কস-এর সমাজ-বিপ্লবের স্বপ্ন এটাই ছিল। এও তাঁর স্বপ্ন ছিল যে একদিন শ্রমিক শ্রেণীর উৎপাদন ক্ষমতা এত বেড়ে যাবে যাতে সকলের জন্যই পর্যাপ্ত পরিমান ভোগ্য সামগ্রী উৎপাদিত হবে, কিন্তু সেই পর্যায়ে না যাওয়া পর্যন্ত কখন শ্রমিক শ্রেণীর কতভাগ দরিদ্র থাকবে এবং কী হারে তাদের দারিদ্র কমবে এই প্রশ্ন তাঁর প্রশ্ন ছিল না। মাও জে দং-ও এরকম প্রশ্ন কখনোই করেন নি, চীনের বিপ্লবের পর বলেছিলেন *এখন 'চীন উঠে দাঁড়িয়েছে',* অর্থাৎ সমস্ত বিশ্ব দেখবে এখন চীন কী করতে পারে। এবং সমস্ত বিশ্ব আজকে দেখছে এই বিরাট দৈত্যটা কেমন করে উঠে দাঁড়াচ্ছে বিশ্বের সেরা শক্তি হবার পথে, যে উঠে দাঁড়ানোর পথে চীনবাসীর অর্থনৈতিক দারিদ্র বিপ্লবের আগের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দ্রত কমতে থাকলেও অনেক, অনেক, চীনবাসীতো বিপ্লবের পরও দরিদ্র থেকেই মৃত্যু বরণ করেছে এবং আজও করছে। আর রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "দারিদ্র সমস্যাটি এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নয়। [মানুষের] সুখের অভাবই বড়ো সমস্যা"... এবং "সুখ সৃষ্টিশীল, তাই এর নিজের ভিতরেই ধন রয়েছে" (৯)। রবীন্দ্রনাথও মানুষের সৃষ্টিশীলভাবে জীবন-পথে এগিয়ে না যেতে পারাটাকেই প্রধান সমস্যা বলে মনে করেছিলেন এবং এই লক্ষ্যে গ্রামে-গ্রামে জনগনকে বিভিন্নরকম সৃষ্টিশীল যৌথ কর্মকান্ডে উদ্বুদ্ধ করবার প্রচেষ্টা করেছিলেন। বিভিন্ন ভাষায় এই তিন জন সমাজ-দার্শনিকই মানুষের সৃষ্টি করতে পারবার সুযোগের চাহিদাকেই তার সবচাইতে মৌলিক চাহিদা বলে চিহ্নিত করেছিলেন এবং এই লক্ষ্যে মানুষকে পারস্পরীক সলিডারিটি ও সহযোগীতায় যোগযুক্ত দেখতে চেয়েছিলেন (১০)। বাস্তবিকপক্ষে অন্তহীন সৃষ্টি করতে পারবার ক্ষমতাই তো মানুষকে পশু থেকে ভিন্ন জীব হিসাবে চিহ্নিত করে, এবং এই অর্থে এই ক্ষমতা ব্যবহার করবার সুযোগের চাহিদাই তো মানুষের সব চাইতে মৌলিক চাহিদা।

বাংলাদেশের মানুষও স্বাধীনতার পর তার দারিদ্রকে প্রধান সমস্যা মনে করেছিল বলে শোনা যায় নি, অনেকেই যার যা ছিল তাই নিয়ে একত্রে দেশ গড়ার কাজে নেমেছিল (১১), এবং অনেকের বিচারে দেশের সকলেই নামতে প্রস্তুত ছিল জাতির পিতার কাছ থেকে ডাক আসলে। এখন তাদের দরিদ্র বলে তাদের 'দারিদ্র' দূর করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে 'দারিদ্র রেখার' ওপারে মাথা গুণতির জন্য বসানো হচ্ছে যে প্রচেষ্টা দেশের বহু দুখী মানুষ প্রত্যাখ্যান ক'রে নানারকম সমাজ-বিরোধী কাজে লিপ্ত হচ্ছে, আর অনেকেই অদৃষ্টবাদী হয়ে পরকালেই ''দারিদ্র বিমোচনের' আশায় ধর্মীয় মৌলবাদের শিবিরে যোগ দিচ্ছে। বিশ্বের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে মানব সভ্যতার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে, মানুষকে মানুষের মর্যাদা না দিয়ে, এই তথাকথিত 'সভ্যতা'র অগ্রগতিই কি বিশ্বে ধর্মীয় মৌলবাদের আগ্রাসনের একটি প্রধান কারণ নয়। চল্‌তি দারিদ্র সংলাপের "দারিদ্র-রেখা" এই বঞ্চনার কথা বল্‌ছে না, কিন্তু চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এই বঞ্চনাই বিশ্ব-দারিদ্রের মূল স্বরূপ বলা যায়, যে দারিদ্রের বিমোচন ও সমাজ-স্থিতিশীলতা মানুষের ন্যুনতম চাহিদাকে গবাদি-পশুর চাহিদার মতো অপরিবর্তনশীল জ্ঞান ক'রে এবং শুধু ম্যাক্রোগণনা অনুযায়ী মাথা-গুণ্‌তিতে এই চাহিদা মেটাবার প্রচেষ্টায় টিপে-টিপে উন্নতি সাধন করে হবার নয়।

৬. কাঠামোগত সংস্কার ও গনশিক্ষা

বলা বাহুল্য, সমস্ত দেশ জুড়ে দুখী মানুষদের জন্য ইঙ্গিত সামাজিক পুঁজির (কম্যুনিটি সলিডারিটির) পরিবেশ সৃষ্টি করবার জন্য, এবং তাদের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্যও, দেশে বড়ো রকমের কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন। বিশেষ করে প্রয়োজন গ্রামাঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠিকে তাদের 'মালিক' শ্রেণীর ওপর পেট্রন-ক্লায়েন্ট সম্পর্ক থেকে মুক্ত করবার জন্য এদেশে ভূমি-কৃষি-জলা সংস্কার। দাস-প্রথা বজায় রেখে যেমন কোন সমাজে দারিদ্র বিমোচনের হিসাব করা অর্থহীন, দেশের বৃহত্তর জনগণকে একটি 'মালিক' শ্রেণীর কাছে পেট্রন-ক্লায়েন্ট সম্পর্কে রেখেও এরকম হিসাব করার যৌক্তিকতা প্রশ্ন করা যায়। এরকম সংস্কার মুক্তিযুদ্ধের প্রতিশ্রুতি ছিল এবং দেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের প্রথম বড়ো প্রস্তাব ছিল। স্বভাবতই দেশের তৎকালীন জোতদার সরকার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। বর্তমান সরকারের নির্বাচন ম্যানিফেস্টোতে ভূমি সংস্কারের স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি রয়েছে (১২) যা থেকে মনে হয় এই প্রশ্নটি জনগনের কাছে ভোটের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলেই পার্টি মনে করেছিল। বর্তমান প্রবন্ধকারী সহ দেশের একটি বিশেষজ্ঞ টীম গত ২২ মার্চ প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে দেখাও ক'রে এই ব্যাপারে আশু পদক্ষেপ নিতে আহবান করে। কিন্তু সরকার এখন পর্যন্ত এই প্রশ্নে নীরব, এবং মনে হয় স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের মতোই কায়েমী স্বার্থের পক্ষ থেকে বাধা এই সংস্কারের পথে অন্তরায় হয়েই থাকবে এবং বরাবরের মতো সরকারী পার্টির "নির্বাচনী ইশতেহার" বলে দলিলটি একটি ভুয়া প্রতিশ্রুতি হিসাবেই থেকে যাবে। তাই এদেশে ভুমি-জলা-কৃষি সংস্কারের জন্য সামাজিক চেতনা বৃদ্ধির আশু প্রয়োজন। আমাদের গর্বের উন্নয়ন-গবেষণা-প্রতিষ্ঠান বি,আই,ডি,এস-এর কাছ থেকে এই প্রশ্নে বিশ্ব-নেতৃত্ব কী আশা করা যায় না?

দেশের মানুষকে দ্রুত শিক্ষিত করে তোলাও অতি প্রয়োজন তাদের কর্মসংস্থান-সম্ভাবনার পরিধি বাড়াবার জন্য, তাদের শিক্ষার অভাবে নানারকম প্রবঞ্চনা (যেমন জমি হস্তান্তরের দলিল না পড়েই সই দেয়া)র হাত থেকে বাঁচাবার জন্য, আধুনিক বিশ্ববাজারে যোগ্যতর প্রতিযোগীতার জন্য, এবং সার্বিকভাবে তাদের জীবনকে দ্রুততরভাবে এগিয়ে নেবার জন্য। এশিয়ার যে সব 'টাইগার' দেশ দ্রুত দারিদ্র বিমোচন সহ উন্নয়ন দেখিয়েছে তারা সকলেই গণশিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েছে, আধুনিক উন্নয়ন সংলাপের "কেপেবিলিটি" তত্ত্বও এব্যাপারে জোর দিচ্ছে। গত ২৬শে মার্চ দেশের প্রধানমন্ত্রী দেশকে ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরতামুক্ত করে দেবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন কিন্তু এব্যাপারে এখনো কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেবার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ আজকে আমাদের হাতে বর্ণমালা শিক্ষাদানের আধুনিক পদ্ধতি আছে - অধ্যাপক আহসানুল হকের "ছবি দিয়ে পড়া শিখি" পদ্ধতি - যা ব্যবহারে যে কোন ব্যক্তি এক মাস থেকে দুই মাসের মধ্যে লিখতে পড়তে শুরু করতে পারে। এই পদ্ধতিতে অত্যন্ত মামুলী খরচে দেশের ছাত্র-তরুণ সমাজের সাহায্যে এক বছরের মধ্যেই - এমনকি একটা বড়ো ছুটিতেই - দেশের সবাইকে সাক্ষর করে তোলা যায় । দেশের নানান্ স্থানে তরুণ-তরুণীরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই এই পদ্ধতিতে নিরক্ষর জনগনকে সাক্ষর করতে নেমে গিয়েছে এবং ক্রমাগত একাজে সাফল্যের সংবাদ আসছে (১৩)। ছাত্র-তরুণ সমাজকে দিয়ে এই পদ্ধতিতে একটি দেশব্যাপী গণশিক্ষার আন্দোলন নামাবার প্রস্তাব নিয়েও শিক্ষা-মন্ত্রীর কাছে যাওয়া হয়েছে কিন্তু এব্যাপারেও তেমন কোন সাড়া পাওয়া যায় নি। মনে হয় কায়েমী স্বার্থ দেশের মানুষকে দ্রুত শিক্ষিত করবার পথেও বাধা হয়ে রয়েছে এতে দুখী মানুষদের জমি-জমা জাল দলিল টিপ্ সই দিইয়ে আত্মসাত করবার এবং এরকম আরো বহুবিধ ছল-চাতুরি দ্বারা তাদের শোষণ করবার পথ বন্ধ হয়ে যাবে বলে। দেশের উন্নয়নের ভিত্তি হিসাবে ভূমি-জলা সংস্কার ছাড়াও দেশব্যাপী গনশিক্ষা প্রোগ্রাম নামাবার জন্যও সমাজ থেকে সরকারের ওপর জোর দাবী আসা প্রয়োজন। যে ভাষার মান রক্ষার্থেই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল সেই ভাষায় স্বাধীনতার এতদিন পরেও দেশের অধিকাংশ মানুষ লিখতে পড়তে পারে না আমাদের এই দারিদ্র পরম লজ্জাষ্কর।

৭. উপসংহার

ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি মানুষের জীবনের বাইরে থেকে বিশেষজ্ঞদের বা উন্নয়ন-সহায়তাদানকারী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা তাদের ইচ্ছামতো "দারিদ্র-রেখা" প্রণয়ন প্রত্যাখ্যান করি। এই প্রশ্নটি পদার্থবিজ্ঞানের মতো কোন হার্ড সায়েন্সের প্রশ্ন নয়, মানুষের জীবনের গভীর যাতনা ও চেতনা-আশা-আকাংখার প্রশ্ন এবং সামাজিক স্থিতিশীলতারও প্রশ্ন যার উত্তর মানুষের সঙ্গে সংলাপ না করে খোঁজা যায় না, বাইরে থেকে ইচ্ছামতো একটা উত্তর তৈরি করলে তার সঙ্গে মানুষের নিজেদের চেতনা ও কার্যকলাপ বিচ্ছিন্ন থেকে যায় (যে-রকম কারণে পাকিস্তানে "ডেকেড্ অব ডেভেলপ্মেন্ট" পালনের মাথাতেই দেশটি দু-ভাগ হয়ে ভেঙ্গে গেল) যেজন্য এরকম মাপ-ঝোঁকের উদ্ধেশ্য বা মূল্য প্রশ্নবিদ্ধ থেকে যায়। মানুষের মতামত নেবার বিভিন্ন প্রক্রিয়া রয়েছে যেমন স্যাম্পল সার্ভে, গণ-জরীপ, গণগবেষণা ইত্যাদি। গনতান্ত্রিক দেশে পার্লামেন্টারি কমিটি গঠন ক'রে তার ওপরও এই দায়িত্ব ন্যস্ত করা যায় সংসদ সদস্যদের নিজের-নিজের এলাকায় জনগণের সঙ্গে বৈঠক ক'রে তাদের মতামত গ্রহন ক'রে এই প্রশ্নে সুপারিশ দেবার জন্য যে সমস্ত সুপারিশের সমন্বয় করবার জন্য একটা পর্যায়ে বিশেষজ্ঞদেরও যুক্ত করা যেতে পারে। *কিন্তু এই অত্যন্ত ভাইটাল প্রশ্নের উত্তর খোঁজবার প্রসেসটা অর্গানিক হওয়া প্রয়োজন।* আশা করি ভবিষ্যতে দেশের দারিদ্র তথা উন্নয়ন বিচারে দেশের দুখী মানুষদের মতামতকে যথার্থ গুরুত্ব দেয়া হবে।

**৮ই জুন ২০০৯ তারিখে জাতীয় প্রেস ক্লাবে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট আয়োজিত সেমিনারে পরিবেশিত।*

<u>টীকা</u>

(১) রবীন্দ্রনাথ ও আই,এল,ও-র উভয়েরই প্রস্তাবের সমালোচনা করা যায়, যেমন কোনটাতেই বার্ধক্যে কোন সোসাল সিকিউরিটির উল্লেখ নাই, এবং অইা,এল,ও-র মৌলিক চাহিদা প্রত্যয়ে পরিবারকে ইউনিট ধরেছে যেখানে পরিবারের ভেতরে ভোগের বিষম বন্টন, নির্যাতন ইত্যাদির প্রশ্ন আছে।

(২) *পভার্টি এসেসমেন্ট ফর বাংলাদেশ,* দি বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট সিরিজ, ওয়ার্লড ব্যাঙ্ক অফিস, ঢাকা. অক্টোবর ২০০৮। এই দারিদ্র রেখায় খাদ্য ছাড়া অন্যান্য চাহিদার জন্য বরাদ্দ কী কী কতখানি বাস্তবিক প্রয়োজন এই হিসাব করে নয়, খাদ্য-চাহিদা মেটায় এরকম মানুষরা এই সব খাতে একত্রে মোট যা খরচ করে (অর্থাৎ <u>তাদের স্বল্প আয়ের জন্য খরচ করতে পারে)</u> এই হিসাব করেই ধার্য করা হয়েছে, যে বরাদ্দের যুক্তিও সন্তোষজনক বলা যায় না।

(৩) আনিসুর রহমান, "গ্লোবালাইজেশন:দি ইমাজিং আইডিওলজি অব্ দি পপুলার প্রোটেষ্টস্ এন্ড গ্রাসরুট্স একশন রিসার্চ". *একশন রিসার্চ,* ২:১, মার্চ ২০০৪।

(৩ক) জুলফিকর আলী, শরীফা বেগম, কাজী শাহাবুদ্দীন, মরিয়ম খান; রুরাল পভার্টি ডাইনামিকস ২০০৫/২০০৬... পি,আর,সি,পি,বি ওয়ার্কিং পেপার ১৭; নায়লা কবীর, স্নেকস্, ল্যাডার্স এন্ড ট্র্যাপস...সিপিআরসি ওয়ার্কিং পেপার ৫০, নভেম্বর ২০০৪।

(৩খ) শরীফা বেগম ও বিনায়ক সেন, "আনসাসটেনেবল্ "লাইভলিহুডস্, হেলথ্ এন্ড আরবান ক্রনিক পভার্টি: রিক্সাপুলারস্ এ্যজ এ কেস স্টাডি. সিপিআরসি ওয়ার্কিং পেপার ৪৬, নভেম্বর ২০০৪।

(৪) ক্রণিক পভার্টি রিসার্চ সেন্টারের *ক্রণিক পভার্টি রিপোর্ট ২০০৪-০৫* এই প্রশ্নটিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছে। আমার পরবর্তী আলোচনাতে প্রস্তাবিত সামাজিক সলিডারিটির ওপরেও এই রিপোর্টে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তবে এই রিপোর্টও দারিদ্রকে শুধু আয়ের প্রশ্ন হিসাবে গণ্য করেছে আয়-নির্বিশেষে মানুষের জীবন-যন্ত্রনা এবং আয়ের ওপর কন্ট্রোলের প্রশ্ন উত্থাপন না ক'রে।

(৫) জেমস্ ডুসেনবেরী, "ইনকাম. সেভিং এন্ড দি থিয়োরি অব কনজুমার বিহেভিয়র"। হার্ভাড ইউনিভার্সিটি প্রেস। ১৯৪৯।

(৬) এরকম কিছু উদ্যোগের কাহিনি কুররাতুল আইন তাহমিন ও সঙ্গীদ্বয়ের *সুবিধাবঞ্চিতের সৃজনশীল উদ্যোগ অনুসন্ধান, প্রচার ও প্রসার (প্রথম খন্ড),* রিসার্চ ইনিসিয়েটিভস্ বাংলাদেশ ২০০৮তে প্রকাশিত হয়েছে।

(৭) 'নিজেরা করি'র কাজের সাম্প্রতিক বিস্তারিত মূল্যায়ন আবুল বরকত ও সহযোগীদের *ডেভেলপমেন্ট এ্যাজ কনশিয়েন্টাইজেশন, দি কেস অব নিজেরা করি ইন বাংলাদেশ,* পাঠক সমাবেশ ২০০৮ বইতে, এবং রিইবের উদ্যোগে গণগবেষণার মুল্যায়ন মুইনূল ইসলামের *দি পভার্টি ডিসকোর্স এ্যান্ড পার্টিসিপেটরি একশন রিসার্চ ইন বাংলাদেশ.* রিইব ২০০৯ বইতে প্রকাশিত হয়েছে। আরো অনেক এন,জি,ও দুখী মানুষদের সঙ্গে কাজ করছে, কিন্তু তাদের কাজ বাইরে থেকে অর্থ-সাহায্য-নির্ভর যার স্থায়ীত্ব নিশ্চিত নয়, এবং বিতর্কিত ক্ষুদ্র-ঋণ-নির্ভরও বিধায় এখানে উল্লেখ করা হলো না।

(৮) অমর্ত্য সেনঃ *ডেভেলপমেন্ট এ্যাজ ফ্রীডম*। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস ১৯৯৯। ইউ,এন,ডি,পি-র হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট সূচকে (এইচ,ডি,আই) এধরণের একটা গুণের বিবেচনা না থাকলে তো নাৎসী জার্মাণী এই সূচক অনুযায়ী প্রথম সারিতেই এসে পড়ে! এই ভয়ানক সম্ভাবনা দূর করবার জন্য প্রচলিত এইচ,ডি,আই-এর সঙ্গে আর একটি পরিমাপ - ধরুন 'ক' - গুণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন যেখানে 'ক' = দেশের প্রাপ্ত বয়স্ক জনগণের শতাংশ যারা কোন না কোনরকম সমাজ-কল্যানকর কাজে লিপ্ত।

(৯) রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা। বিষ্ণুবসু ও বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাঃ) প্রতিভাস, কলকাতা, ১৯৮৯।

(১০) রবীন্দ্রনাথের "স্বাতন্ত্র্যের পরিণাম". *ধর্ম.* রবীন্দ্র রচনাবলী ১৩. এই রচনাটি ব্যক্তি-সত্ত্বা ও যৌথসত্ত্বার দ্বৈত সম্পর্কের ওপর একটি অসাধারণ গভীর ও প্রাঞ্জল আলোচনা যা মানবতা-ধ্বংসকারী ব্যক্তিস্বার্থবাদী বিশ্বদর্শনের বর্তমান সঙ্গীন অবস্থায় সকলকে পড়তে আহ্বান করি।

(১১) মোহাম্মদ আনিসুর রহমান (সম্পাদিত). *যে আগুন জ্বলেছিল, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ।* গণপ্রকাশনী ১৯৯৭।

(১২) "পল্লী উন্নয়নে নাগরিক সুযোগ-সুবিধার পরিধি বিস্তৃত করা হবে। ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বিতরণ, খাস জলাশয় ও জলমহাল প্রকৃত মৎস্যজীবিদের বন্দোবস্ত দেয়া হবে। সমুদয় জমির রেকর্ড কম্পিউটারায়ন করা হবে এবং জমি, জলাশয়ের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও সামাজিক ন্যায় বিচারের লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার কমিশন গঠন করা হবে।" *নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ইশতেহার ২০০৮*, অনুচ্ছেদ ৭.৪।

(১৩) তানজিনা রহমানঃ "ব্যানিশিং ইল্লিটারেসী", *স্টার ক্যাম্পাস* ৩১ মে ২০০৯ দেখুন। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে দেশের নানা স্থানে তরুণ-তরুণীদের স্বেচ্ছাব্রতী গণশিক্ষা আন্দোলনের একটি বিবরণ রয়েছে জহুরুল হাসান টুটলের "নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও বাংলাদেরে তরুণ সমাজ" শীর্ষক রচনায়, *বাংলাদেশে গণগবেষণা পত্রিকা* ডিসেম্বর ২০০৮ সংখ্যায়।